বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সীর নেতাজী কি জয়শ্রীর চারনিকের মহাকাল ?

-অরুন রায় সরকার

মো-৯৬১২৬৮৮৭৮৫

click here

নেতাজী একদিকে যেমন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। অপরদিকে তিনি একজন জেনারেল। এই দুটি চরিত্রই নেতাজীর জীবনে দেখা গিয়েছে। শৌলমারী আশ্রমে একাধিক সারদানন্দজী ছিলেন। সেটা তৎকালীন আইবি অফিসার বেনু ঘোষের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। শৌলমারী পর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি একাধিক সারদানন্দজীর মধ্যে একজন সারদানন্দজী দেরাদুনে চলে যাচ্ছেন। তার সাথে আশ্রম সেক্রেটারী রমনী রঞ্জন দাস ও তার মেয়েও সেখানে চলে যাচ্ছেন। ১৯৭৭ সালে ঐ সাধু ঋষিকেষে সমাধি নিয়ে দেহ ত্যাগ করছেন এবং তার অন্ত্যেষ্টিতে উত্তম চাঁদ মালহোত্রা, কর্নেল প্রিতম সিং, শৌলমারী আশ্রমের সেক্রেটারী রমনীরঞ্জন দাস উপস্থিত ছিলেন। মুখার্জী কমিশনে একদল ভক্তরা সাক্ষী দিয়েছিলেন যে শৌলমারীর সাধু সারদানন্দজী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৭৭ সালে মারা গিয়েছেন আবার এও দাবি করা হয়েছে ১৯৬৪ সালে নেহেরুর শবদেহের পাশে সারদানন্দজীরূপী নেতাজীই উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনে cw-35 বাবা ভান্ডারী দাবী করেছেন সন্ত সম্রাট নেহেরুর শবদেহে মাল্যদান করার জন্য দিল্লীতে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সাধুকে সারদানন্দজী ও সন্তসম্রাট দাবী করা হয়েছে। আনন্দনাথজীর ভক্তরা তাঁকে নেতাজী দাবী করেন এবং এটা ভিশন ২৪চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে জানিয়েছেন আনন্দনাথজীই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। আনন্দনাথজীর ভক্তরা মৌনীবাবার কাছেও যাচ্ছেন। কিন্তু ভগবানজীর ভক্ত অনুজ ধরের বক্তব্য নেহেরু শবদেহের পাশে সাধু নেতাজী ছিলেন না তিনি কোন এক কম্বোডিয়ান সাধু বীরা ধর্মাবীরা ছিলেন।

ভারত সরকারের ভূমিকা লক্ষকরার পর ফালাকাটা শৌলমারী আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে সাধুজী চলে যান। আশ্রম ভেঙ্গে যাওয়ার পর আনন্দনাথজীর চন্দন নগর বিপ্লবী পীঠস্থান প্রবর্তক সংঘে আগমন যাকে ভক্তরা নেতাজী দাবী করেন। শৌলমারী ভেঙ্গে দিয়ে সারদানন্দজীর ডামী ঋষিকেষে চলে যাচ্ছেন, আর আনন্দনাথজী প্রবর্তক সঙ্ঘে কিছু দিনের জন্য এসেছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশের যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। চন্দননগরের এই বিপ্লবী পীঠস্থান প্রবর্তক সংঘের একটি ইতিহাস আছে। এখানে অগ্নীযুগের বিপ্লবীরা যেমন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু,ত্রৈলক্য মহারাজ থেকে শুরু করে অনেক বিপ্লবী এখানে এসেছিলেন। অগ্নীযুগের বিপ্লবী যারা এই প্রবর্তক সঙ্গে এসেছিলেন তাদের

সকলের নাম এই পাথরের ফলকে সর্নাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই পবিত্র প্রবর্তক সংঘের সংঘগুরু মতিলাল দত্ত নিজেও একজন বিপ্লবী সাধক ছিলেন। গান্ধীজী তার জীবনে দুইবার এই বিপ্লবী সংঘ তীর্থে এসে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন।

ত্রৈলক্য মহারাজ যখন প্রবর্তক সংঘে এসেছিলেন তখন যারা উনাকে সেবা করেছিলেন তাদের মধ্যে মমতা দাস একজন ছিলেন। তিনি এই সংঘে সন ১৯৫৭ সাল থেকে সেবা কাজে নিযুক্ত। ১৯৬৭/৬৮ সালে প্রবর্তক সঙ্ঘে নেতাজী আনন্দভাই নাম নিয়ে যখন এলেন তখন মমতা দিদি নেতাজীর সেবা যত্ন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ২০১৫ সালে ভিশন২৪ এর ক্যামারায় এই কথা মমতা দিদি আমাদের জানিয়েছিলেন।

শৌলমারী পর্বে পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি শৌলমারীর একাধিক সাধুর মধ্যে একজন সাধু ঋষিকেশে চলে যাচ্ছেন এবং ১৯৭৭ সালে সেখানে মারা যাচ্ছেন। সেই সাধুর অন্ত্যেষ্টিতে নেতাজীর মহানিস্ক্রমনের সাথী যিনি কাবুলে যাওয়ার পথে সাহায্য করেছিলেন সেই উত্তমচাঁদ মালহোত্রা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল প্রীতম সিংকে ঋষিকেষে ঐ সাধুর অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত হতে দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে আনন্দনাথজী বা আনন্দভাই পরিচয় নিয়ে নেতাজী কোলকাতার বুকে বিপ্লবী পীঠস্থানে এসেছেন। এখানে বাংলাদেশ থেকে ত্রৈলক্য মহারাজও এসেছিলন। বর্তমানে ত্রৈলক্য মহারাজের চিঠি ফৈজাবাদে বাক্সভর্তি ডকুমেন্টে পাওয়া গিয়েছে তাতে বাংলাদেশের যুদ্ধের কথার আভাস রয়েছে।

আনন্দনাথজী যখন কোলকাতা থেকে চলে যান   তখন   যারা আনন্দনাথজীরূপী নেতাজীর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন তাদের উপর নির্দেশ ছিল আনন্দনাথজীর বাক্সভর্তী ডকুমেন্ট ফৈজাবাদে যেন পাঠিয়ে দেওয়ার হয়। ভক্তরা সেই নির্দেশ অনুযায়ী আনন্দনাথজীর ব্যবহৃত ডকুমেন্ট ঘড়ি ফটো সব ফৈজাবাদে পাঠিয়েদিয়েছিলেন।

আনন্দনাথজীর সাথে যারা কোলকাতাতে যোগাযোগে এসেছিলেন তারা পরবর্তীকালে ২০০২ সালে উত্তরভারতে নৈমিষারন্যে নেপালের সীমান্তবর্তী কোন এক অঞ্চলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আনন্দনাথজীর ভক্তদের দাবী নেতাজী কিছু দিন ফৈজাবাদে ছিলেন কিন্তু সবসময় যে তিনি সেখানে বসে থাকতেন সেটা সত্য নয়। ফৈজাবাদে নেতাজীর ডামি থাকতেন তার নাম নরেন মিত্র এমনটাও তারা জানিয়েছেন। আনন্দনাথজীর ভক্তদের দাবী নরেন মিত্র ফায়জাবাদের এপিশোডের পরে কোথায় চলে গেছেন তারা তাকে আর খোজে পান নি। মুখার্জী কমিশনের সাক্ষীদাতা cw-35 বাবা ভন্ডারী জানিয়েছিলেন, “গুমনামী বাবা আমাদের মত একজন ছিলেন সে নেতাজী নন এবং গুপ্তর ঘাটে কুড়ি কেজি আটা ও লাকড়ির চেলী দিয়ে একটি দেহ তৈরী করে দেহ সৎকার করার নাটক করা হয়েছিল। কমিশনে ভান্ডারী বাবা জানিয়েছিলেন- নেতাজী ব্রক্ষ্মঋষির ন্যায় নৈমিষারন্যে সন্ত সম্রাটের নাম নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন।

দেশ যদি নেতাজীকে চায় তবে ভান্ডারীবাবার সাথে যোগাযোগ করা হলে সন্ত সম্রাট উপস্থিত হবেন । এবং সেই যোগাযোগের official ঠিকানা ছিল সীতাপুরের আর্মি ক্যান্টনমেন্ট এড়িয়ার ভিতর ভৈরব মন্দির । সেই মন্দিরের এরিয়ার গভীর জঙ্গলে দিনের বেলায় ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায় ।রাতে সেখানে থাকা মুসকিল । সেই ভৈরব মন্দিরে মুখার্জী কমিশন officially যান নি । অন্যদিকে মৌনীবাবা ওরফে সন্তসম্রাটের সাথে নেতাজীর চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে এই কথা কমিশনে হলফনামা দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল অমর বাহাদুর সিং জানিয়েছিলেন । ভগবানজীর ভক্তরা অমর বাহাদুর সিংকে সম্মান জানাচ্ছেন তাঁর সাথে ফটো তোলে নিজেদের ধন্য মনে করছেন কিন্তু তার সাক্ষীকে গুরুত্ব দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন এই দৃশ্যই আমরা বিগত দিনে দেখতে পেয়েছি ।

সুতরাং ১৯৫৬ সালে আমরা দেখতে পেয়েছি নেহেরু শাহনওয়াজ কমিটির মাধ্যমে নেতাজীকে মেরে ফেলে রেঙ্কোজীর চিতাভস্মকে সীল মোহর লাগাচ্ছেন । আবার শৌলমারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং বেঙ্গলভলেন্টিয়ার্সের নেতা মেজর সত্যগুপ্তের ঐতিহাসিক ঘোষনাতে নেহেরু সরকার বেকায়দায় পড়ে যায় এবং অবশেষে শৌলমারীর সাধুর গতিপথকে থামিয়ে দিতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও আনা হয়েছিল ।

ইন্দিরাগান্ধীর আমলে খোসলা কমিশন বসে । সেই কমিশনের রিপোর্টেও নেতাজীকে মৃত প্রমান করার চেষ্টা করা হয়; তেমনি নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সাধুর বেশে নেতাজীকে অস্বীকার করে খোসলা কমিশনে বলানো হল যে ১৯৬৪ সালে নেহেরুর শবদেহের পাশে কম্বোডিয়ার সাধু বীরা ধর্মাবীরা ছিলেন । বর্তমানে ভগবানজীর ভক্ত অনুজ ধর এটা প্রচার চালাচ্ছেন যে- নেহেরু শবদেহের পাশে নাকি নেতাজী ছিলেন না । যদিও ভারত সরকারের তোলা ডকুমেন্টারী ফিল্ম থেকে ঐ সাধুর দৃশ্যমান অংশটি ভূত দেখার ভয়ে বিনা কারন দর্শায়ে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন ভারত সরকার ।

শৌলমারী সাধু আদৌ নেতাজী কিনা বা নেতাজীর সাথে তার কোন যোগাযোগ আছে কিনা সেটা সরকার পরিস্কার করে জনগনকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে । শৌলমারীতে আইবি অফিসারদের ক্যামারা দিয়ে সাধুজীর ফটো তুলে আনার জন্য পাঠানো হচ্ছে । শৌলমারী নিয়ে নেহেরুর এই উঁকিঝুঁকিতে এটা বলা যায় না যে শৌলমারী নেহেরু সরকারের বানানো ছিল না । দেশের কর্তৃপক্ষ নেতাজীর প্রতি কি ভাবনা রাখেন সেটাই ১৯৬২ সালে শৌলমারী থেকে পরিস্কার হয়েগিয়েছিল ।

পাশাপাশি শহনওয়াজ কমিটির রিপোটের উপরেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। পরবর্তীকালে ইন্দিরাগান্ধী খোসলা কমিশন বসাতে বাধ্য হলেন । সেই কমিশনেও নেতাজীকে পুনরায় মৃত প্রমান করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু সেই মৃতব্যক্তি পুনরায় ১৯৮৫ সালে ফৈজাবাদের বাক্সভর্তি ডকুমেন্টের মাধ্যমে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠলেন ।

আমরা দেখতে পাচ্ছি শৌলমারী পর্ব শেষ হলে নেতাজীর শত্রুদের দৃষ্টি দেরহাদুনে স্থানান্তরিত করা হল আবার কোলকাতাতে নেতাজীকে আনন্দনাথজী রূপে ভক্তরা পেয়ে গেল। তেমনি ১৯৮৫ সালে ফৈজাবাদে নেতাজী যেমন জীবিত প্রমান হল তেমনি মুখার্জী কমিশনে মুজেহানা পর্ব উঠে আসলো।

১৯৭৭ সালে নেতাজী ডামি সারদানন্দজী নাম নিয়ে ঋষিকেষে মৃত্যুকে বরন করছেন।আবার ফৈজাবাদে গুমনামী বাবার নাম নিয়ে নরেন মিত্র মৃত্যুকে বরন করার নাটক রটনা করেছেন। পরবর্তীকালে মুখার্জী কমিশনে ১৯৮৫ সালের গুমনামী বাবা রহস্যে নেতাজীর ব্যবহৃত জিনিষ থেকে নেতাজী জীবিত থাকা প্রমান হল কিন্তু দেশবাসী ও সরকারকে জীবিত নেতাজীকে গ্রহন করতে চায় কিনা তার জন্য মুজেহানা অধ্যায় শুরু হল।

১৯৯৭ সালে নেতাজীর মৃত্যু ১৯৪৫ সালে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনাতে হয়েছে সেটা প্রমান করার জন্য দিল্লীতে নানা অনুষ্ঠান ও ডাকটিকিট ইস্যু করা হল এবং নেতাজী মেমোরিয়েল বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যাতে দেশবাসির অন্তরে মৃত নেতাজীর স্মৃতি জাগিয়ে রাখা যায়। যদিও নেতাজীর মৃত্যুর কোন অকাট্য প্রমান দেশের সরকারের কাছে নেই।

১৯৯৯ সালে মুখার্জী কমিশন বসলে ভবগানজীর ভক্তরা নেতাজীকে মহাসিন্ধুর ওপারে পাঠানোর চেষ্টায় মেতে উঠেন। পরবর্তীকালে তারা black box of history film বানিয়ে এটা প্রমান করার চেষ্টা করে যে বিচারপতি মনোজ মুখার্জী ফৈজাবাদের বাক্সভর্তি ডকুমেন্ট ও বি লালের রিপোর্ট দেখার পর ব্যক্তিগত ভাবে ভগবানজীকে নেতাজী বিশ্বাস করে তার একশো শতাংশ বিশ্বাসের কথা জানিয়েছিলেন ঐ সাধুই নেতাজী।কিন্তু বিচারপতি ভগবানজীর কোন ফটো দেখেননি।

প্রশ্ন হল নেতাজী ১৯৮৫ সালে মারা গেছেন এই কথা কিন্তু বিচারপতি কখনও বলেন নি। কিন্তু ভগবানজীর ভক্তরা বিচারপতির ঐ একশ শতাংশ বিশ্বাসের কথাকে গুপ্তরঘাটের সাথে যুক্ত করে নেতাজীকে মহাসিন্ধুর ওপারে সূক্ষ্মে দেহে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে ১৯৮৫ সালে গুপ্তর ঘাটের রটনাকে ঘটনার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে ভগবানজির ভক্তরা।

মুখার্জি কমিশনের চ্যায়ারম্যান মনোজ মুখার্জী গুপ্তর ঘাটের গল্পকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে মৌনীবাবার সাথে ২০০৩ সালে ভান্ডারী বাবার উপস্থিতিতে unofficially দেখা করেছিলেন। কমিশনের কোর্টমাষ্টার চিত্ত মোহন চট্টোপধায় ভিশন২৪ ক্যামেরায় সামনে স্বীকার করেছিলেন গুপ্তর ঘাট কোন বার্নিং ঘাট ছিল না এবং সেই বিষয়ে বিচার পতি বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

এখানেই গুমনামী বাবা বা ভগবানজীর ভক্তদের আপত্তি বিচারপতি কেন তার রিপোর্টে গুমনামী বাবাকে নেতাজী স্বীকার করেন নি। বিচারপতি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ভগবানজির ভক্ত অম্লান কুসুম ঘোষ এমনটাই টিভি চ্যানেলে বসে দাবী করেছিলেন।

যদি বিচারপতি মনোজ মুখার্জী গুমনামী বাবা (ভগবানজিকে) নেতাজী এই কথা কমিশনে লিখতেন তাহলে ভববানজীর ভক্তরা নেতাজীকে officially মহাসিন্ধুর ওপারে পাঠিয়ে দিতেন । গুপ্তর ঘাটের ভগবানজীর নামে যে সমাধি বানানো হয়েছিল তাতে ??? টি প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে ।

বাস্তববাদীরা গ্রহনের মাধ্যমে বর্জন করে। তাই আমরা ভগবানজী বা গুমনামী বাবার ভক্তদের দাবী যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই সেই ক্ষেত্রে ঘটনাটি “ঐ মহামানব আসে” বইয়ের চারনিকের বক্তব্য অনুযায়ী এই দাঁড়াবে যে- মহাকাল রুপী নেতাজী ১৯৮৫ সালে তাঁর জীর্ণদেউল পরিবর্তন করে নতুন দেহে প্রবেশ করে অন্তর্ধান করেছেন এবং নেতাজীর জীর্ণ দেহটি গুপ্তর ঘাটে সৎকার করা হয়েছে এটাই কিন্তু মেনে নেওয়া হবে । সুতরাং কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে নেতাজীর where about এর বিষয়ে তদন্ত করা বা মহাকালের জাগতিক ঠিকানা ১৯৮৫ সালের পর হদিস করা অবান্তর বিষয় এটাই কিন্তু জয়শ্রীর বক্তব্য ধরা পড়ছে । ভগবানজির ভক্তরা যারা ১৯৮৫ সালের পর যারাই এগোতে চান না তাদের অন্তরে কিন্তু এই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে ।

সুতরাং, ১৯৮৫ সালের পর মহাকালরুপী নেতাজীর জাগতিক ঠিকানা মহাপুরুষ মহাপুরুষে যেভাবে যোগানুভূত দর্শন মিলন সম্ভব সেই ভাবে নেতাজীকে দর্শন লাভ সম্ভব এমনটাই চারন “ঐ মহামানব আসে” পুস্তকে দাবী করলেন । জয়শ্রীর দাবী গুপ্তর ঘাটে একটি দেহ সৎকার করা হয়েছে, সেটাই ডঃ মধুশোধন পাল সোলাল সাইটে জানাচ্ছেন । কিন্তু কমিশনে অন্যান্য সাক্ষীদাতা যেমন বাবা ভান্ডারীর বক্তব্য গুপ্তর ঘাটে ১৯৮৫ সালে কোন দেহ সৎকার করা হয়নি । আনন্দনাথজী রুপী নেতাজীর ভক্ত সত্যব্রত তপাদার মহাশয়ের দাবী ফৈজাবাদে যিনি থাকতেন তিনি নেতাজীর ডামি নরেনমিত্র ছিলেন এবং ১৯৮৫ সালের এপিসোডের পর নরেনমিত্র কোথায় চলে গেছেন উনারা খোজ করে পাচ্ছেন না ।

মুখার্জী কমিশনে নেতাজীর whereabout জানার বিষয়ট term of reference এর মধ্যে ছিল নেতাজী জীবিত থাকলে কোথায় কোন পরিস্থিতিতে জীবিত রয়েছেন । কিন্তু ভগবানজির ভক্তরা “কমিশনের রিপোর্ট সাবমিট করার আগেই ঐ মহামানব আসে পুস্তকের ৩২১ পাতায় তাদের রায় ঘোষনা করে জানিয়েদিলেন যে, নেতাজী ১৯৮৫ সালে আকাশবৃত্তির রৌপ্যজয়ন্তীতে গৃহ বদল করলেন, যোগানুভুতি । জীর্ণ দেউলটি ফেলে নতুন দেউলে প্রবেশ অর্থাৎ নেতাজী নতুন দেহেতে কায়াপ্রবেশ করেছেন এটা চারন জানিয়েদিলেন । অন্যদিকে তৎকালীন ভারতের প্রধানমত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী রেঙ্কোজী মন্দিরে মাল্যদান করে নেতাজীর স্মৃতি সেখানে রাখা আছে জানালেন । ১৯৯৭ সালে এই অটল বিহারী বাজপেয়ী বিরোধী নেতা হিসাবে তার ভাষনে জানিয়েছিলেন – নেতাজী অশ্বথামার মত চিরঞ্জীবী click । মহাভারতের অশ্বথামার যে কাহানী শোনা যায় তাতে অশ্বথামার কৃতকর্মের জন্য কৃষ্ণের অভিশাপের কারনে তার মৃত্যু হবে না । সোসাল সাইটে বিভিন্ন টিভি চ্যনেলেও অশ্বথামার জীবিত থাকার বিষয়ে বহু রিপোর্টিং রয়েছে । নেতাজী স্বাধীন দেশে অশ্বথামার মত জীবিত কেন হবেন । নেতাজীর এমন

কি অপরাধ করেছেন যার কারনে তাকে অশ্বত্থামার মত জীবন কাটাতে হবে ? আসলে নেতাজীকে নেহেরু সরকার যুদ্ধাপরাধী ঘোষনা করে গেছে, ১৯৯৭ সালে ইউনাইটেড নেশনের সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্যও সেই আভাস পাওয়া যায় যে অতীতে নেতাজীর প্রতি যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার সেক্রেটারী জেনাজেল আনডু করতে অক্ষম।

ভারত সরকারের উপর যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দায় রয়েছে এবং বিচারপতি সঠিক পথে এগোচ্ছিলেন সেই গতিবিধি দেখার পর কমিশনকেও অসহযোগীতা করে নানা ভাবে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এই বিষয়ে কমিশনের চ্যায়ারম্যান ও কোর্টমাষ্টার ক্যামেরার সামনে জানিয়েছিলেন।

বিচারপতির উপর সরকারের পক্ষে যেমন চাপ আসতে থাকে তেমনি গুমনামী বাবার ভক্তরাও উনাকে চাপ দিচ্ছিলেন যাতে ভগবানজীকে নেতাজী ঘোষনা করা হয় । প্রশ্ন হল বিচারপতি তাদের কথা অনুযায়ী যদি ভগবানজী বা গুমনামী বাবাকে নেতাজী ঘোষনা করতেন তাহলে ভগবানজীর ভক্তরা গুপ্তরঘটকে প্রতিষ্টা করে আনন্দিত হতেন ।কিন্তু বিচারপতি সেই পথে চলেননি। তিনি গুপ্তর ঘাটের গল্পকে নাসাৎ করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং ১৯৮৫ সালের পর নেতাজীকে যারাই জীবিত বলবেন সেই ক্ষেত্রে ভগবানজীর ভক্তরা আপত্তি করবেন এটাই স্বাভাবিক । কারন তারা ২০০২ সালেই বই লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন – মহাপুরুষ মহাপুরুষে যে যোগানুভত দর্শল লাভ সম্ভব – বাস্তবে যা ঘটেছে অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে যা ঘটেছে তাকে অতিক্রম করে মহাকালের জাগতিক ঠিকানা হদিশ অপ্রাসঙ্গিক বলেই চারণ মনে করে। এই হল জয়শ্রীর একাধিক চারনিকদের বক্তব্য ও নেতাজীর ইস্যুতে তাদের stand point।

যেহেতু জয়শ্রীতে একাধিক চারনিক মহাকালরূপী নেতাজীর বক্তব্যকে কেবল পরিবেশন করবেন এমটা বর্তমান জয়শ্রী মনে করছেন তাহলে বলতে দ্বিধানেই চারনিক কি নেতাজীর উপর কপিরাইট প্রাপ্তি করেছেন নাকি ? নেতাজীর সাথে চারনই একমাত্র যোগাযোগ রক্ষা করবেন ? চারন যা বলবে সেটাই কি আমাদের একবাক্যে মেনে নিতে হবে ?

জয়শ্রী শৌলমারীকে নেহেরু সরকারের বানানো এটা বুঝানোর প্রচেষ্টা কেন করল ? এর কারন একটাই হতে পারে শৌলমারী থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে আনন্দনাথজীকে ২০০২ সালে ভক্তরা দর্শন লাভের সুযোগ পাচ্ছেন । সেখানে ভগবানজীর ভক্তদের মহাকালের জীর্ণ দেউল পরিবর্তন করার গল্পটি আর টিকছে না। সুতরাং "ঐ মহামানব আসে" পুস্তকের পরিবর্ধিত অখন্ড সংস্করন ২০১০ সালের প্রকাশিত পুস্তকের ৪১৬ পাতায় চারন তার গল্পের কিছু নাটকীয় পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন । কারন জীর্ণ দেওয়ালের পরিবর্তন করে মহাকালরূপী নেতাজী নতুন দেউলে প্রবেশ করেছেন এই গল্পটি যেহেতু আর খাওয়ানো যাচ্ছে না। তাই একটু কায়দা করে চারন ঐ পাতায় জানালেন – "চারদশক পর ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরার্বিভাব ও

নিস্ক্রমন । এক্ষেত্রেও কোন প্রত্যক্ষ দর্শী নেই । মিলিটারী কেন্টনমেন্টের সংগঠিত ঘটনা- তাদেরই রক্ষানা বেক্ষনে ও অপ্রত্যক্ষ পরিচালনায় নবতর ঘটনাটি সংগঠিত হল । ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালের যেন পুনরাবৃত্তি ।"

প্রশ্ন হল ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন হবে । জয়শ্রী তো ঐ মহামহানব আসে পুস্তকে ২০০৩ সালের অখন্ড সংস্করন করে ৩১৯ পাতায় জানিয়েছিলেন, "মহাকাল জীর্ণ দেউলটি ফেলে নতুন দেউলে প্রবেশ করলেন ।"

অর্থাৎ- জয়শ্রীর মহাকাল কায়াপ্রবেশ করলেন এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হল । সেই ক্ষেত্রে পূর্বের দেহটি গুপ্তর ঘাটে সৎকার করা হয়েছে সেটা জয়শ্রীর চারনের বক্তব্য । তাই জয়শ্রী গুপ্তর ঘাটকে বার্নিং ঘাট মনে করতে বাধ্য তাদের গল্পের story কে মেনটেন করতে হবে । তবেই তো চারণ এটা বলতে পারবেন যে,- মহাকালের জাগতিক ঠিকানা হদিস তার কাছে অপ্রাসঙ্গিক । প্রশ্ন হল চারনের কাছে কি প্রাসঙ্গিক আর কি অপ্রাসঙ্গিক নয় সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার । তাই অন্যান্য গবেষক ও নেতাজী প্রেমীরা ১৯৮৫ সালের পর কি এগোবেন না ? নিশ্চয়ই এগোবেন । কারন গুপ্তর ঘাট একটি সাজানো গল্প ছিল । এই গল্পের পাতা ফাঁদে জয়শ্রী পা দিয়েছিলেন এখানেই প্রমান হয় তারা মহাকালরূপী নেতাজীর কতটুকু কাছে যেতে পেরেছিলেন । বানান গল্পের story চারন যে ভাবে পরিবেশন করে চলেছে তাতে অনেক নেতাজী প্রেমীরাও পা দিয়েছেন পরে তারা অনুভ করতে পেরেছেন সত্যটা কি । আদিপর্ব ও উত্তরপর্বে অমিল ধরা পড়ছে ।

শৌলমারীর মাধ্যমে দেশের সরকার ও কর্তৃপক্ষ নেতাজীকে চায় কিনা সেটা প্রমান হয়েগিয়েছিল। মুখার্জীকমিশন চলাকালীন কমিশনের কার্যকে যেভাবে প্রভাবান্বিত করার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীকে রেঙ্কোজীতে যেতে দেখা গিয়েছে ২০০১ সালেও কর্তৃপক্ষের চাওয়ার মধ্যে ফাঁক রয়েছে । তারা প্রকৃত অর্থে জীবিত নেতাজীকে চায় কিনা । এই ভাবে মুখার্জী কমিশনের চ্যায়ারম্যানকে কমিশনের কার্যে সরকার যেমন অসহযোগীতা করেছিল তেমনি ভববানজীর ভক্তরা বিচারপতির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথাটিকে গুপ্তর ঘাটের সাথে যুক্ত করে মহাকাল জীর্ণ দেউল পরিবর্তন করেছেন এমনটা জনগনের কাছে ক্লিম বানিয়ে বিচারপতির সাথে তারা ছল চাতুরী করে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথাটিকে তাদের মতন করে রটনাকে ঘটনার রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিল ।

মুখার্জী কমিশনে cw-35 বাবা ভান্ডারী ওরফে শিবভগবান ব্যক্তি সন্তসম্রাট ওরফে মৌনীবাবাকে নেতাজী দাবী করেছিলেন, সেই দাবীকে সাপোর্ট সমর্থন করলো আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল অমর বাহাদুর সিংয়ের বক্তব্য । কর্নেল সিং জানিয়েছিলেন মৌনীবাবা (সন্তসম্রাট)র সাথে তিনি নেতাজীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন । এরপরেও ভগবানজির ভক্তরা মৌনীবাবা ও ভান্ডারীবাবাকে ভারতসরকারের মদত পুষ্ট এই অপবাদ দেওয়ার ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে সামিল হয়ে "চক্রবূহে নেতাজী" পুস্তকে প্রচার করে । তাদের দাবীর সমর্থনে তারা কোন তথ্য

দেখাতে পারেন নি । জয়শ্রীও তাদের পুস্তকে শৌলমারীকে নেহেরু সরকারের বানানো বলে দাবী করে ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ও মেজর সত্যগুপ্তকে মিথ্যাবাদী বলার চেষ্টা করে ।

আমরা বিপ্লবী লীলা রায়ের জয়শ্রীর উদ্যোগকে সম্মান জানাই কিন্তু একাধিক চারনের বক্তব্যকে বিবেকের দ্বারাই গ্রহন করবো । যতটুকু সত্য পাব তা গ্রহন করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই । বিপ্লবী লীলারায়কে অসম্মান করার কোন অভিপ্রায় আমাদের অন্তরে নেই । কিন্তু লীলারায়ের একমাত্র উত্তরসূরী সেজে যদি একাধিক চারনিকের আবির্ভাব ও তাদের লেখা পড়ে আমরা বিভ্রান্ত হই সেই ক্ষেত্রে আমরা জয়শ্রীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করবই – ? ইতিমধ্যে চারনিকের বক্তব্যের উপর নতুন প্রজন্ম প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে । অবশ্য তার যথেষ্ট কারনও রয়েছে। ।

ঐ মহামানব আসে পুস্তকে চারনিক বাংলাদেশের যুদ্ধ প্রসঙ্গে মহাকালের যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন সেই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য - যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন জেনারেল তার war strategies গোপন রাখেন কারন তার পরিকল্পনা শত্রুপক্ষের হাতে চলেগেলে তাকে যুদ্ধে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে । বাংলাদেশের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মহাকাল চারনিককে সব বলে দিচ্ছেন, কোন ঘটনার ঘটলে যুদ্ধে কি পরিনতি হবে ।

জয়শ্রীকে মহাকাল সেই কথাগুলি খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত করার কথা নাকি বলেছেন যাতে শত্রুপক্ষ যুদ্ধের পরিকল্পনা জানতে না পারেন । এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি, নেতাজী যখন শত্রুপক্ষের মধ্য দিয়ে জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে সমুদ্র পথে সাবমেরিনে দক্ষিন পূর্ব এশিয়াতে রওয়া হয়েছিলেন তখন নাকি নেতাজী তার দাদাকে তাঁর বিবাহ ও কন্যার কথা জানিয়েছিলেন। এমন একটি চিঠি কৃষ্ণা বসুরা প্রকাশ করেছেন । আমরা মনে করি সেটি জাল চিঠি । সেই চিঠিতে নেতাজী যে ভয়ঙ্কর যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন সেটাও উল্লেখ করেছিলেন ।

ভেবে দেখুন চারদিকে শত্রু তার মধ্যে দিয়ে গোপন যাত্রা শুরু করার আগে কেউ এমন চিঠি লিখে থাকবেন ? নেতাজীর গোপন পরিকল্পনা যদি এত সস্তা হত তবে ১৯৪১ সালে মহানিস্ক্রমনের গল্পের কাহিনী আজ পর্যন্ত কেন পূর্ণ রুপে আবিস্কার করতে পারল না ।

প্রশ্ন হল নেতাজী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে গোপনে যাত্রা করছেন সেখানে তিনি নিশ্চিয়ই চাইবেন না এমন কোন চিঠি বা নথী বা পরিকল্পনা শত্রু পক্ষের হাতে চলে যাক । তাহলে বাংলাদেশের যুদ্ধের পূর্বেই কোথায় কি হবে এবং কি করে পাকিস্থানের পরাজয় হবে এমন সব কথাগুলি নেতাজী চারণকে বলে দিচ্ছেন । এটা কি একজন জেনারেলের কাছ থেকে আশা করা যায় ? বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে চারন কি মহাকালের কথা বলছেন নাকি তার নিজের কথা বলছেন । অথচ চারনের দাবি করছেন সে মহাকালের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন । এই ভাবে অন্ধ ভক্ত হয়ে আমরা বর্তমান জয়শ্রীর চারনদের নেতাজীর উপর তাদের একমাত্র কপিরাইট রয়েছে সেটা একবাক্যে মেনে নিতে রাজী নই । কারন আমাদের বুদ্ধি ও বিবেক রয়েছে ।

সুতরাং জয়শ্রীর চারণ নামধারী ব্যক্তি সত্যিই কি নেতাজীর সাথে সাক্ষাৎ করে এই কথা গুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন ?

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে একজন জেনারেলের war strategic point কি সেটা যেমন জানা যায় না বা তিনি কাউকে এ বিষয়ে ইঙ্গিতও দিতে পারেন না ? শত্রুপক্ষের দুর্বলতা যেখানে সেখানে আঘাত আনার আগে সে কখনও কাউকে বলতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধের আগেই চারন সব জেনে যাচ্ছেন । বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি মন্ত্রগুপ্তি তবু তারা কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা ব্রিটিশ পুলিশের কাছে ধরা পড়েছিলেন। প্রশ্ন হল জয়শ্রী গোষ্ঠীর কার্যধারাতে বিশ্বাসী ডঃ পাল ও একদা টিভির পর্দায় জানিয়েছিলেন যে জয়শ্রী অফিসে নাকি বিগত দিনে চুরি হয়েছিল তাহলে জয়শ্রী শত্রুপক্ষের নজরে ছিল সেটা কি মহাকাল জানতেন না ? তাহলে তো নেতাজীর বাংলাদেশের যুদ্ধের পরিনতি বা শত্রুপক্ষের কোথায় আঘাত আনার পর তারা কি ভাবে হার স্বীকার করবে এই কথা গুলি যদি চারণ লিপিবদ্ধ করে রাখে সেগুলি তো জয়শ্রীর অফিস থেকে শত্রুপক্ষের কাছে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে তাই নয় কি ? আরেকটি প্রশ্ন বিপ্লবী লীলারায় দিলীপ রায়কে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই প্রতিলিপি জয়শ্রীর "ঐমহামানব আসে পুস্তকের" ৩৪২ পাতায় ছেপে বের হচ্ছে। একটি বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক যে বিপ্লবী লীলারায় উক্ত চিঠিতে লিখেছিলেন যে *"দয়া করে চিঠিটি পড়ে পত্রবাহক আমার শুভার্থী শ্রীমতি শৈল সেনকে দিয়ে দেবেন । কারন এভাবে লেখা আমার উচিৎ না । তবে আমার কথায় আপনার যদি বিশ্বাস থাকে জানবেন 100 p.c. fact. দয়া করে ২য় ব্যক্তিও যেন না জানে সেটা আমার উপর stern injunction… /- আপনাদের লীলা রায়"*

লীলা রায়ের এই চিঠির বক্তব্য থেকে বুঝা গেল চিঠি চালাচালী নেতাজীর বিষয়ে এই ব্যাপারে stern injunction রয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে যদি মহাকালের কাছে চিঠি চালাচালি করা হয়ে থাকে সেগুলি কি ডামিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাতে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি অন্যত্র পরিচালিত করা যায় !

বাংলাদেশের যুদ্ধ প্রসঙ্গে ত্রৈলক্য মহারাজ্রের চিঠি ফৈজাবাদে গুমনামি বাবার আস্তানা থেকে পাওয়া গিয়েছে । চন্দন নগরের বিপ্লব সঙ্ঘতীর্থ প্রবর্তক সংঘে ত্রৈলক্য মহারাজ এসেছিলেন ? উনাকে সেই সময় যারা সেবা যত্ন করেছিলেন তারা আজও জীবিত রয়েছেন। প্রশ্ন হল জয়শ্রীর চারণ কি সেই সময় ত্রিলক্য মহারাজের সান্নিধ্যে এসেছিলেন বা প্রবর্ত্তক সংঘের সাথে যোগাযোগে ছিলেন ? ত্রৈলক্য মহারাজের চিঠি ফৈজাবাদে পাওয়া যাচ্ছে এবং চন্দন নগরে প্রবর্তক সঙ্খে যাদের কাছে তিনি সেবা নিচ্ছেন তারা দাবী করছেন শৌলমারী পর্ব সমাপ্তি হলে ১৯৬৭/৬৮ সালে নেতাজী আনন্দ ভাই নাম নিয়ে চন্দন নগরে প্রবর্তক সঙ্খে এসেছিলেন। তারপর সেখান থেকে সুরেশ নৈয়োগীর বাড়ীতে তিনি চলে গিয়েছিলেন। সেই সময় দুই বছর সুরেশ নৈয়োগীর বাড়ীতে এই কোলকাতা মহানগরীতে অবস্থান করেছিলেন আনন্দভাইরূপী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ।

বিশেষ গন্যমান্য ব্যক্তিরা সেই সময় আনন্দনাথজীর সাথে দেখা করতে সুরেশ নিয়োগির বাড়ীতে এসেছিলেন । সেই সময় যারাই নেতাজীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সত্যব্রত তপাদার ও পদ্ম মিত্র সহ আরও অন্যন্যরা । পরবর্তীকালে আনন্দনাথজী নৈমিষারন্যে চলে আসার আগে কোলকাতা থেকে নেতাজীর ব্যবহৃত জিনিস গুলি ফৈজাবাদে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সত্যব্রত তপাদারকে বলেছিলেন , সেই অনুযায়ী তারা সেগুলি ফৈজাবাদে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন । ২০০২ সালে আনন্দনাথজীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সত্যব্রত তপাদার মৌনীবাবার আশ্রমে কেন গিয়েছিলেন ? সত্যব্রত তপাদার উত্তরভারতে নেপাল সীমান্তবর্তী কোন এক স্থানে আনন্দনাথজীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, এই কথা তিনি ডঃ জয়ন্ত চৌধুরীকে জানিয়েছিলেন । তাহলে বাংলাদেশ যুদ্ধ চলাকালীন war strategic পয়েন্ট এর দৃষ্টিতে নেতাজীর কোথায় অবস্থান করা উচিৎ ছিল ফৈজাবাদ নাকি কোলকাতাতে ? ফৈজাবাদে নেতাজী কিছু দিন ছিলেন এই কথা আমরা অস্বীকার করছিনা । সেটা সত্যব্রত তপাদারও স্বীকার করেছেন । ভান্ডারী বাবাও আমাদের জানিয়েছিলেন নেতাজী কিছুদিন ফৈজাবাদে ছিলেন । কিন্তু গুমনামি বাবা নেতাজী নন, সেটা সত্যব্রত তপাদার ও বাবা ভান্ডারী জানিয়েছিলেন । কিন্তু গুমনামী বাবার আস্তানা থেকে প্রাপ্ত জিনিস গুলি নেতাজীর সেটা প্রমান হয়েছে । তাতে নেতাজীর জীবিত থাকার বিষয়টি প্রমান হয়েছে । যেখানে একাধিক multiple আমির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে সেখানে শৌলমারীতে যেমন একাধিক আমি ছিলেন তেমনি ফৈজাবাদ ও মুজেহানাতেও একাধিক আমি থাকা স্বাভাবিক । ভান্ডারী বাবা জানিয়েছিলে সুভাষ বাবু আপনে সুরক্ষা কেলিয়ে ষোলা সুভাষ বানায়া হ্যায় ইনমেসে আসলি তো এক হী হ্যায় । ইয়ে জো গুমনামি বাবা হ্যা বো হ্যামী লোগো মে সে এক থে – সুভাষ ন্যাহী ।

ভান্ডারী বাবার কথার মধ্যে বুঝা গিয়েছিল যে তিনিও একাধিক আমির মধ্যে একজন আমির ভূমিকা পালন করেছিলেন । এবং নেতাজী এক জায়গায় বসে থাকতেন না সেটাও ভান্দারী বাবার কথাতে ধরা পড়েছে । ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ জানিয়েছিলেন সুভাষ গেরুয়া পড়ে বসে থাকার লোক নন ।

বাংলাদেশের গ্যারিলা যোদ্ধা তথা মুক্তি যোদ্ধা বাঘা সিদ্দিকীর মত নেতারা ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সান্নিদ্ধে এসে নিজেদের ধন্য মনে করছেন । মেজর সত্যগুপ্ত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসছেন । প্রবর্ত্তক সংঘের মমতা দিদিও বালক ব্রহ্মচারী সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবগত রয়েছেন । শ্রীশ্রী ঠাকুর ১৯৬৭ সালে বেহালাতে নেতাজীর জন্মদিনে এক ভাষনে জানিয়েছিলেন – নেতাজীর মত ও পথ আমার সাথে একই মত ও পথে আছে ।

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীকে মহারাজকে জয়শ্রীর চারন মহাসাধক মনে করছেন । সেই ওঙ্কারনাথজী ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের চরন পাদুকা স্পর্শ করে তাকে নারায়নরূপে সম্বোধন করে ধন্য হচ্ছেন কিন্তু চারণ বা জয়শ্রীর কাউকে আজ পর্যন্ত শ্রীশ্রী ঠাকুরের কাছে যেতে দেখা যায় নি । বরং কি করে শ্রীশ্রী ঠাকুর ও মেজর সত্যগুপ্তকে মিথ্যাবাদী প্রমান করা যাবে সেই চেষ্টা করা হয়েছে ঐ মহামানব আসে বইয়ে । সুতরাং একাধিক চারনিকের

মধ্যে কে সঠিক কে ভূল সেখানেও দ্বন্দ্ব রয়েছে । একজনের সাথে আরেকজনের মিল পাওয়া যাচ্ছে না ।

গত জুলাই ২০০৩ সালে "ঐ মহামানব আসে" পুস্তকের অখন্ড সংস্করন করা হল। তার ৩১৯ পাতায় বলা হল "আমাদের হিসেবের ১০ বছর মহাকালের হিসেবে ১ বছর এবং সেই হিসেবে মাত্র চারটি বছর কাটল। পুনরায় একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল । তাঁরই আকাশবৃত্তির রৌপ্যজয়ন্তীতে তিনি গৃহ বদল করলেন, যোগানুভুতি। জীর্ণ দেউলটি ফেলে নতুন দেউলে প্রবেশ করলেন – তাই শবানুগমনে যাঁরা ছিলেন বলতে পারেন না তাঁরা কি দেখেছেন ।" [পৃ-৩১৯]

অর্থাৎ ২০০৩ সালে জয়শ্রীর পক্ষে জানানো হল মহাকাল জীর্ন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ নিয়েছেন । এবং সেটা যোগানুভুত ।

এখন যে প্রশ্নটি আসছে সেটি হল – মহাকালের ১ বছর আমাদের হিসেবে যদি ১০ বছর হয় তা'হলে 'ঐ মহামানব আসে' পৃ-১৩৩ পাতায় আদিপর্বে মহাকালের কথোপকথন থেকে একটি প্রসঙ্গ এখানে উপস্থাপন করা প্রয়োজন ; মহাকাল বলছেন – [তোমাদের হিসাবে আমার কত বয়স? বল্লাম ৭৫ এ পড়বেন । কী ? আরও ৪৬ বছর থাকতে হবে ?]

অর্থাৎ ১২১ বছরে পর্যন্ত মহাকাল দেহে থাকবেন আমাদের হিসাবে । কিন্তু মহাকালের হিসাবে ৪৬ বছর মানে ৪৬x১০=৪৬০ বছর । তাই ১৯৮৫ সালে মহাকাল তাঁর জীর্ণ দেউল পরিবর্তন করে নতুন দেউলে প্রবেশ করেছেন এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হল । কারন ১৯৭২ সালে মহাকালের ৭৫ বছর সেই হিসাবে তিনি আরও ৪৬ বছর দেহে থাকবেন সেটা জানিয়েছিলেন চারনের বক্তব্য অনুযায়ী । তাহলে মহাকাল ১৯৭২ সালের এই কথাগুলি বলার পর মাত্র ১৩ বছর পরেই তিনি দেহ পরিবর্তন করে ফেললেন কেন ?

প্রশ্ন হল মহাকাল ২২১ পাতায় জানিয়েছিলেন – " এই আমার শেষ মনুষ্য শরীর । আর মনুষ্য-শরীরে জন্মগ্রহন হবে না ।" [ওগো পথের সাথি নমি বারম্বার]

তাহলে তো মহাকাল তার আগের মনুষ্য শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর নিয়েছেন, চারনের বক্তব্য অনুযায়ী । হিসেবটা কেমন যেন হয়ে গেল !

এখম মজার গল্প হল এই যে, মহাকালের বক্তব্যে ১৩৩ পাতায় যা রয়েছে তার সাথে ১৯৮৫ সালের জীর্ণ দেউল পরিবর্তনের গল্প ফিটিং হচ্ছে না তাই আরেকটি গল্প ৩২১ পাতায় রচনা করা হল ২০০২ সালে । সেটি হল- [আমাদের ১ বছর আর মহাকালের নাকি ১০ বছর সেই অনুযায়ী চারটি বছর কাটল]

প্রশ্ন হল মহাকাল বলছেন ১৮ বছরে জেনারেশন হবে না ৩০ বছরে জেনারেশন তবে তিনি সেদিন কেন এটা বললেন না যে তোমাদের ১০ বছর হল আমার এক বছর । ১৩৩ পাতায় মহাকাল আরও ৪৬ বছর দেহে থাকবেন সেটা জানিয়েছিলেন অর্থাৎ (৪৬x১০) = ৪৬০ বছর মহাকাল দেহে থাকবেন সেই হিসাবে মহাকালের ৪টি বছর মাত্র কাটল এটা নতুন করে চারন জানাচ্ছেন । অতএব জীর্ণ দেহ নিয়ে এতগুলি বছর মহাকালকে কাটাতে হবে তাই মাত্র ৮২ বছরে একবার কায়াকল্প করে মহাকাল নতুন দেহে প্রবেশ করলেন এটা চারনিক বুঝাতে চাইলো । এক কথায় ১৯৭৩ সালের চারনিকের বক্তব্যের সাথে ২০০১ সালের চারনিকের বক্তব্যের গোজামিল দিয়ে মিলানো হল । অর্থাৎ আদিপর্বের সাথে উত্তরপর্বের অমিলকে মিল করানোর চেষ্টা করা হল। কিন্তু বিচক্ষন ব্যক্তিদের কাছে চারনের এই চালাকিগুলি ধরা পড়তে বাধ্য । কিছু নেতাজী গবেষক এই বিষয়গুলি এড়িয়ে কিসের বিনিময়ে বর্তমান জয়শ্রীর গুনগান করছেন সেটা বুঝা যাচ্ছে না ।

ঐ মহামানব আসে পুস্তকে একাধিক হাতে কলম চলছে তাই গল্পের আদি পর্বের সাথে উত্তরপর্বের মিল নেই সেটাই মিল করানোর জন্য চারন একটা term প্রয়োগ এটা জানালেন যে- আমাদের ১ বছরের হিসেবকে মহাকালের ১০ বছর বলা হল ।

ফৈজাবাদে গুপ্তর ঘাটে নেতাজীর ইস্যুকে full stop লাগিয়ে থামাতে গিয়ে যে গল্প কথার অবতারনা চারণ করেছে তাতে আদিপর্বের গল্প থেকে চারণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ।

নেতাজীকে রাশিয়াতে মারা যাচ্ছে না । তাইহুকোতে মারা গেল না । ফৈজাবাদেও মারা যাচ্ছে না কারন গুপ্তর ঘাট কোন বার্নিংঘাট নয়; শবদেহের নেই কোন ডেথ সার্টিফিকেট বা ফটো তাই লোককে বিশ্বাস করানো যাবে না । তাই জীর্ন দেউল পরিবর্তন করে মহাকাল অন্য নতুন দেহ ধারন করেছেন এবং তার পরবর্তীরূপকে কেউ চিনতে পারবেন না । সুতরাং ১৯৮৫ সালের পর নেতাজীর where about খোজ করা অবান্তর বিষয় এমনটাই যেন জয়শ্রী বুঝাতে চেষ্টা করেছে জয়শ্রীর চারণ । চারণ কার পক্ষে এই সিধ্যান্ত জানাচ্ছেন । চারনের এই সিদ্ধ্যান্তে কাদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে ?- এই প্রশ্ন নেতাজী প্রেমীদের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।

ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং যারা শৌলমারীর আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা সারদানন্দজীকে নেতাজী দাবী করেছিলেন এবং কোলকাতাতে আনন্দনাথজীকে নেতাজীরূপে পেয়েছিলেন তারা যখন পরবর্তীকালে ২০০২ সালে আনন্দনাথজীকে মৌনীবাবা ওরফে সন্তসম্রাটের রূপে পেয়ে যাচ্ছেন সেখানে শৌলমারী থেকে মুজেহানা পর্বের যোগাযোগ কে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্যই ভগবানজির ভক্তরা প্রচেষ্টা করেছেন এমটাই কিন্তু অনুভব করা যাচ্ছে । সুতরাং এই যোগসূত্রকে পাশ কাটানোর প্রয়াসে শৌলমারীকে নেহেরু সরকারের বানানো বলে দেওয়া হল , কেশব ভট্টাচার্য বই লিখে মৌনীবাবা ও ভান্ডারী বাবাকে ভারত সরকারের

মদতপুষ্ট বলে দিল । প্রফেসর নন্দ লাল চক্রবর্তী শৌলমারী ও সীতাপুরের মৌনীবাবাকে বাবা থিউরী বলে উপহাস করে সোসাল সাইটে প্রচার চালাচ্ছেন ।

শৌলমারী নেহেরুর বানানো ছিল এটা বলে দিয়ে চারণ সাংঘাতিক ভূল করে ফেলেছে । কারন শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ও মেজর সত্যগুপ্তকে তারা পরোক্ষে নেহেরু সরকারের মদত পুষ্ট বুঝানোর অপচেষ্টা করে লক্ষ কোটি সন্তান দলের কর্মীদের আঘাত করেছে।

বর্তমান জয়শ্রী মহাপুরুষদের প্রতি যে দ্বিচারিতা করেছে সেগুলি আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে - যেমন "তব চরনতলে সদা রাখিও মোরে" শীর্ষক লেখনী প্রকাশ করে ৩২৮ পাতায় একজায়গায় তারা লিখছেন – " বাংলা ১৩৭৫ সালের একটি চিরকূট প্রাপক মূকুল- ওরফে সুনীল দাস – প্রেরক পরমসিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ ঠাকুর মহাশয়ের । চিঠির নানা অংশের বিশেষ দাগ মহাকালের ।"

ঠাকুর ওঙ্কারনাথজী জয়শ্রীর কাছে একজন পরমসিদ্ধমহাপুরুষ কিন্তু ওঙ্কারনাথজী ঠাকুর যে মহাপুরুষকে নারায়ন জ্ঞানে তার চরনযুগল স্পর্শ করে নিজেকে ধন্য মনে করছেন, সেই মহাপুরুষ হলেন ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ যাকে জয়শ্রী মিথ্যাবাদী প্রমান করতে চাইছে ? এতে কি পরমসিদ্ধমহাপুরুষ ওঙ্কারনাথজীকে জয়শ্রী অপনাম করে নি ?

শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেছেন নেতাজী ও হিটলার জীবিত । এবং তারা দুজনকে একই জায়গায় পাওয়ার আশা রাখি । কিন্তু ১৯৭২ সালের জয়শ্রীর ঐ মহামানব আসে পুস্তকের ১১৫ পাতায় এটা জানানো হচ্ছে যে – হিটলার, ... রইল না ।"

তাহলে কি বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ মিথ্যা কথা বলেছিলেন যে হিটলার জীবিত ? ১৯৭৩ সালে মহাকালের বক্তব্য ঐ মহামানব আসে পুস্তকের আদিপর্বের ১৩১ পাতায় লিপিবদ্ধ করছে [এই মরুভূমিতে একটি বিশেষ পর্বতমালায়, সঙ্গে থাকবেন এখানকার বড় বড় archaeologists-রাও । তোমাদের সামনে একটা জায়গা দেখিয়ে বলবো যে এই জায়গাটা খোঁড় সেখান থেকে বের হবে অতি সযত্নে সংরক্ষিত একটি দেহ । আমি প্রথমে বলবো না এটা কার ? যখন মাথা চুলকাতে থাকবে তখন বলবো, একজন ফারাও ।]

ফারাও হল হিটলারের উপাধি । অর্থাৎ হিটলার মারা গিয়েছেন এটা জয়শ্রীর মহাকালরূপী নেতাজীর বক্তব্য । তাহলে বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ যে জানিয়েছিলেন নেতাজী ও হিটলার একজায়গায় রয়েছেন তার কি হবে ? জয়শ্রীর মহাকালরূপী নেতাজীর বক্তব্য থেকে তারা এটা বুঝানোর চেষ্টা করছে বালক ব্রহ্মচারী যে নেতাজীকে জীবিত বলছেন সেটা জয়শ্রীর মহাকাল বা নেতাজী নয় । খুব সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজকে মিথ্যাবাদী প্রমান করার জন্য করা হয়েছে ।

তাহলে বর্তমান জয়শ্রী যাকে নেতাজী দাবী করছে সেই মহাকাল কিন্তু মেজর সত্যগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী, ও শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের নেতাজী নন এটাই জয়শ্রী বই লিখে জানিয়ে দিলেন। যখন কমিশনে cw-41 আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল অমর বাহাদুর সিং দাবি করলো যে মৌনীবাবার (সন্তসম্রাট) চেহারার সাথে তিনি নেতাজীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন সেখানে গুমনামী বাবার দাতের DNA test এর রিপোর্টের পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশের কথা যারা প্রেস কনফারেন্স করে জানাচ্ছেন তারা ২০০১ সালে মৌনীবাবা বা সন্তসম্রাটের Dna test করার কথা তুলতে পারলেন না কেন ? যেখানে cw-35 সন্ত সম্রাটকে (মৌনীবাবাকে) কমিশনে হলফ নামা দিয়ে নেতাজী দাবী করেছিলেন। প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার ষড়যন্ত্রে যারা সামিল তাদের পক্ষ ভুক্ত হয়ে নেতাজী গবেষনা এগোতে পারে না। তারা সত্যের দিকে তাকাতে পারে না তাই তারা সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনীবাবার ডি এন এ টেষ্টের দাবী করতে পারলেন না, ব্যক্তি যখন ২০০২ সালে উপস্থিত তখন গুমনামি বাবার দাঁতের dna report নিয়ে এত হৈ হোল্লোর কেন ? ব্যক্তির dna test করে নিলে সব মিটে যেত তাই নয়কি ? বর্তমানে নতুন করে যারা গুমনামী বাবাকে প্রতিষ্টিত করতে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে গুমনামী বাবার আস্তানা থেকে প্রাপ্ত দাঁতের সম্পূর্ণ dna test এর রিপোর্ট সরকারের কাছে প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছেন সত্য উদঘাটন করার জন্য তারা কি সন্ত সম্রাটের পরিচয় বা বাবা ভান্ডারীর পরিচয় জানার জন্য চেষ্টা করেছিলেন ? না তারা সত্যের প্রকাশ চান না। তারা চান ডিক্লাসিফাইড ইস্যু নিয়ে জনগনকে দৃষ্টি আকর্ষন করে নেতাজীকে নিয়ে খেলা করা । তাদের আচরনে মনে সন্দেহ জাগে এরাও কি তাহলে তাদেরই …পক্ষে কাজ করে চলেছে ? বর্তমানে গুমনামি বাবা ইস্যু নিয়ে যারা লম্ফঝম্ফ শুরু করেছেন তাদের নেতাজী প্রেম দেখে সন্দেহ জাগে।

বাংলা দেশের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে- ত্রৈলক্য মহারাজের সাথে নেতাজী যোগাযোগের প্রমান পাওয়া যাচ্ছে। চন্দন নগরের বিপ্লবী পীঠস্থানে ত্রৈলক্য মহারাজ আসছেন। বিপ্লবী লীলারায়ের অবর্তমানে একাধিক চারনিকরা নেতাজীর একাধিক আমির মত একজন আমির সাথে দেখা করতে উত্তরভারতে যেতেন কিনা সেটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। কারন,

নেতাজীর মহানিস্ক্রমনের গোপন পরিকল্পনার সাথে যুক্ত বিপ্লবী ও সর্বশ্রেষ্ট সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সী প্রসঙ্গে জয়শ্রী জানাচ্ছে –

[৯জানুয়ারী প্রত্যুষে দলে দলে বিপ্লবী সতীর্থরা মিলিত হয়েছেন। সেই ছোট খাটো, স্বল্পবাক, অথচ জেদি একগুঁয়ে সংকল্পে অবিচল বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সীর মহাযাত্রায় এসেছেন শ্রদ্ধা জানাতে । ভীড়ের মধ্যে চারণও ছিল । চারণ সংগোপনে স্বল্পপরিসর ঘরটিতে প্রবেশকরলো , প্রণতি জানালো । সে ভাবছিল কোথায় সে গরিমা, কাকে আজ বলবেন, তিনিই একমাত্র যোগসূত্র নিরুর্দিষ্ট মহানায়কের। একটি দিনের কথা মনে পড়ে যায়, তখন নড়াচড়া কম, বিছানায় শুয়ে বলছিলেন, শেষ সাক্ষাতের হৃদয়মথিত সেই প্রতিজ্ঞাবাণী, আমরা মিলব, একসঙ্গে কাজ করবো, আবার একসঙ্গে অন্তিমলোকে যাত্রা করবো । কিন্তু কই তিনি যে একা চললেন ! সেই মুহূর্তে

চারনের হাতে এসে আরেকটি হাতের স্পর্শ পড়লো । একটু দূরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং মহাকালের বার্তা ক্যুরিয়ার চারণকে অর্পন করলো । বিস্ময়কর যোগাযোগে বিমূঢ় চারণ । ক্যুরিয়ার মারফৎ সেই মহাযাত্রার লগ্নে নববর্ষের শুভেচ্ছা এলো । সত্যই মহাকাল সর্ববিরাজমান । সম্ভবত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মহানায়কের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে মহাযাত্রায় ক্যুরিয়ারের যোগদান । [পৃ-২৫৭]

সত্য বক্সীর সাথে নেতাজীর যোগাযোগ হয়েছিল কি সেই বিষয়ে জয়শ্রীর চারনের কোন বক্তব্য আজ অবধি প্রকাশ পায়নি । চারন এতটুকু বুঝাতে চাইলো যে সত্যবক্সী নেতাজী সাথে এক সাথে সাক্ষাৎ হবে এক সাথে কাজ করবে এই আশা নিয়ে দেহ ত্যাগ করলেন । কিন্তু চারনিকের সাথে মহাকালের যোগাযোগ ক্যুরিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে । নেতাজীর সাথে সত্যবক্সীর যোগাযোগ হয়েছিল কিনা সেটা বিপ্লবের গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিত সত্যবক্সী ব্যতীত অন্য কেউ বলতে পারবে না । কিন্তু জয়শ্রীর মহাকালের সাথে সত্যরঞ্জন বক্সীর সাক্ষাৎ হয়নি এটা চারন তার লেখনীর মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করেছে । আমরা নেতাজীর হোমফ্রন্ট পুস্তকের ক্রোড়পত্র Netaj and B.V সূচীপত্র থেকে ১৩৬ পাতায় ফুটনোট থেকে জানতে পারি যে – নেতাজীর গোপন কর্মকান্ডে শ্রীসংঘ, লীলারায় এবং অনিল রায় অনুপস্থিত । সুতরাং লীলারায় বা জয়শ্রীর চারন নেতাজীর গোপন পরিকল্পনা জানার কথাও নয় । সুতরাং সত্যরঞ্জন বক্সীর সাথে নেতাজীর যোগাযোগ হয়েছিল কিনা সেটা চারণ লিখতে পারে না । জয় হিন্দ